Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.32-37
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রতিবাদী অনুষঙ্গে পৌরাণিক চরিত্রের পুনর্নির্মাণ ও বাণী বসুর নির্বাচিত উপন্যাস

মহাশ্বেতা চ্যাটার্জি
গবেষক, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল ও সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In the novels of Bani basu, we saw different zoner. She always surprises us through her writing. Actually she cult all the characters of her fiction, with the compact reality.In this article we completely shown other side of her novels. In the novels like- 'Kalinidi', 'KhatraBadhu', 'Krishna', 'Krishno', 'Khatta' all these novel characters' were taken from 'Mahabharata'- and she just explaining her own strong opinion. Why we took these novels for that article? Why in that present situation we inculcate this 'Legendry' (Pouraanik) characters? Some untold stories were really in there? Nowadays we think about it deeply, because all kind of political and social hegemony occur everyday. Our Legendry books are so updated if we get into it, we really amazed. In every aspects of Bani Basu's such novels we minutely analysis the whole introversion.

Keywords: Legendry characters, Socio –reality, Mankind, Womanhood, Psychological aspects.

বাণী বসুর উপন্যাসে ইতিহাস এবং পুরাণের প্রসঙ্গ প্রায়শই এসে পড়ে। ঔপন্যাসিক যেন সময়ের বেড়াজাল টপকে অনায়াসেই তাঁর কাহিনি স্থল পরিবর্তিত করে নিয়ে যেতে পারেন।বাণী বসুর এই ইতিহাস, পুরাণ, মহাকাব্যের প্রতি নিজস্ব ভালোলাগার একটি সুস্পষ্ট পরিসর রয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন, ঐতিহ্যশালী গৌরবোজ্জ্বল অতীতের নানান ঘটনাপ্রবাহকে তিনি তাঁর উপন্যাসে নির্দ্বিধায় সংযুক্ত করেছেন।

মহাভারতের কাহিনি গুলিকে তিনি সম্পূর্ণ রূপে আজকের দৃষ্টিকোণ থেকে- যুক্তিপূর্ণ তথ্য সহযোগে, মানবিক আদর্শকে সামনে রেখে, নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। মহাভারতের অমিত ঐশ্বর্যের তলায় যে তথ্য, চরিত্র বা বলা যায় ঘটনাগুলি চাপা পড়ে গিয়েছিল তাকেই তুলে এনে নতুনভাবে উপস্থাপিত করেছেন ঔপন্যাসিক বাণী বসু।সাধারণ অর্থে 'পুরাণ' কোনো ইতিহাস নয়। ইতিহাসেরই কথা পুরাণ বিবৃত করে। পরিবর্তনশীল ইতিহাসের সময় ক্রমের হদিস খানিকটা হলেও লুকিয়ে থাকে পুরাণের মধ্যে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত- এই পাঁচটি লক্ষণ পুরাণে পরিলক্ষিত হয়। রামায়ণ এবং মহাভারত- এই মহাকাব্য দুটি পুরাণের সর্বসম্মত আদর্শ গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। ইতিহাস, ধর্ম, সমাজনীতি, দৈব্যলক্ষণ, লোকগাথা- এই সমস্ত কিছুর সমন্বয়েই পুরাণের ব্যাপ্তি। ঔপন্যাসিক বাণী বসুর কলমে এই পুরাণের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা প্রতিবাদী চরিত্র, অথবা প্রতিবাদী ঘটনাক্রম উঠে এসেছে নিজস্ব সক্রিয়তা নিয়ে।

> " পুরাণ- কথার ধর্মই এই যে তা একই বীজ থেকে -শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে, ভৌগোলিক সীমান্ত ছাড়িয়ে- বহু বিভিন্ন ফুল ফোটায়, অনেক ভিন্ন-ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে।" [১]

বাণী বসুর লেখা 'কালিন্দী' উপন্যাসটি জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ লাভ করে। পুরাতন ভারতবর্ষে জন্ম নেন এক নারী। ধীবর কূলে জন্ম হয় কালিন্দীর। ধীবরকূলের দাসরাজার স্ত্রী ক্ষত্রিয় রাজপুরুষের সঙ্গে মিলিত হলে, জন্ম হয় কালিন্দী। দাসরাজা মেয়েকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। মেয়ের জন্ম রহস্য সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। তিনি স্থির করলেন কোন এক রাজপুরুষ যেমন তার বংশে পুঁতে দিয়েছে নিজের বীজ, তিনিও রাজপুরুষদের বংশে পুঁতে দেবেন এই বীজ। মেয়েকে তিনি পৃথিবীর রানি হবার স্বপ্ন দেখাতে শুরু করলেন।

একদিন পরাশর মুনি, খেয়া-পারাপার করতে গিয়ে কালিন্দীর সঙ্গে মিলিত হলেন। মৎস্যগন্ধা কালিন্দী মুনির দেওয়া সুরভিসার মেখে যোজনগন্ধা হলেন। নয় মাস দশ দিন পর কালিন্দীর এক সন্তান জন্মায়।পরাশর মুনি বলেন এই সন্তান সারাজীবন মায়ের পাশে পাশে থাকবেন।

ধীবর কুলের পরমাসুন্দরী কালিন্দীকে দেখা মাত্রই ভালোবেসে ফেলেন হস্তিনাপুরের বৃদ্ধ রাজা শান্তনু। ভীষ্ম, দাসরাজার কাছে এসে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। তিনিও শর্ত করিয়ে নেন-

> " অদূর ভবিষ্যতে আমার মেয়ের ছেলে যদি সিংহাসন পায় একমাত্র তবেই এ বিয়ে দেওয়া যাবে, নইলে নয়।" [২]

বুদ্ধি করে মেয়ের জন্য রানি হবার পথ সুগম করে নেন দাসরাজা। রাজবংশে অনার্য রক্তের প্রবেশ করানোর স্বপ্ন অচিরেই পূর্ণ করে ফেলেন তিনি।

শান্তনুর সঙ্গে বিবাহ হল কালিন্দীর। রাজ বাড়ির আদবকায়দা শেখানো এমনকি শিক্ষাদীক্ষারও ব্যবস্থা করা হল তার জন্য। তার নতুন নামকরণ করা হল-সত্যবতী। মহারাজা শান্তনুর ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম লাভ করল এক রুগ্ন শিশু। নাম দেওয়া হল তার বিচিত্রবীর্য। ষোল বছরের দীর্ঘাঙ্গী কন্যা কালিন্দী, সতের আঠারো বছরের তরুণ যুবক দেবব্রতের সাহচর্য লাভ করার আশায় উদগ্রীব হয়ে উঠল। কিন্তু সংযমী ভীষ্ম কোনোদিনই সত্যবতীর এই ভালোলাগাকে প্রশ্রয় দেন নি। সত্যবতী প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। বৃদ্ধ রাজার পত্নী করে নিয়ে এসে চিরতরে যেন দমন করা হয়েছে সত্যবতীর সমস্ত চাওয়া পাওয়াকে, মনের ভিতরে ঘুরপাক খাওয়া সমস্ত ইচ্ছেগুলোকে। প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন সত্যবতী।

> " দেবব্রত বলল – লজ্জা নেই আপনার? আইনের কুটিল গতি শেখাচ্ছেন? নীতি নেই? আদর্শ নেই?
> খলখল করে হেসে উঠল সত্যবতী।
> -নীতি? আর্দশ?
> একজন স্বাধীন অরণ্যকুমারীর সাধ, আশা সব চূর্ণ করে বৃদ্ধ শকুনের হাতে নিজের প্রেমিকাকে তুলে দেওয়া কোথাকার নীতি? কোন আদর্শ ? "[৩]

দেবব্রত ভীষ্মকে- সমস্ত দ্বিধা, দ্বন্দ্বের উর্দ্ধে উঠে ভালোবাসা জানিয়ে ছিলেন সত্যবতী। কিন্তু, দেবব্রত সেই কথায় রাজি না হওয়াই তাকে চলে যেতে বলেন সত্যবতী।কিছুদিনের মধ্যেই বিচিত্রবীর্যের জন্ম দেন সত্যবতী।কিন্তু সন্তানটি বেশ রুগ্ন ছিল। অম্বা-অম্বালিকার সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়া হয়। স্বল্পায়ু বিচিত্রবীর্য মারা যান।রাজা শান্তনুর বংশ একেবারে শেষ হয়ে গেলে, পরাশর মুণি ও সত্যবতীর সন্তান কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে আহ্বান জানানো হয়। তার ঔরসে তিন সন্তান জন্ম লাভ করে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর শান্তনুর মৃত্যুর পর কুরুবংশ শেষ হয়ে গেলে শুরু হয় কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বংশ। সকলের অজান্তেই অনার্য রক্তের অনুপ্রবেশ ঘটে যায় ক্ষত্রিয় রাজবংশে।

'কৃষ্ণ' উপন্যাসটি প্রকাশ লাভ করে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে। পরাশর মুনি সত্যবতীকে দেখা মাত্রই তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন। তারা মিলিত হলেন এক নির্জন দ্বীপে। ঠিক তার কিছু মাস পরেই জন্ম লাভ করেন কৃষ্ণ। কিন্তু শিশু জন্মানোর পরই পিতা পরাশর তাকে নিজের কাছে রাখেন। পিতার পরিচর্যায় মানুষ হতে থাকলেন কৃষ্ণ। আশ্রমে দাস-দাসীদের ঔদাসীন্যতায় কৃষ্ণের শৈশব অতিক্রান্ত হতে লাগল।

উদাস শিশুর মনে সারাদিন নানান প্রশ্ন এসে ভিড় জমাতো। সেই প্রশ্নগুলির উত্তর সে নিরন্তর খুঁজে চলছে। কেন তার মা তার কাছে থাকেন না? এই প্রশ্ন সরাসরি তার পিতাকে করে সে। পরাশর মুনি ছেলেকে বোঝাতে পারেননি কৃষ্ণ তার মায়ের কুমারী অবস্থার সন্তান। কিভাবে তার মা রানি হয়েছেন অথচ তার পিতা আশ্রমের মুনি; ঘটনা গুলো কিছুতেই মেলাতে পারে নি কৃষ্ণ। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের প্রতিবাদী সত্তাকে, কেউ দমিয়ে রাখতে পারেননি। পিতা পরাশরকে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, তাকে লালনপালনের প্রয়োজনের কথা কেন তার মনে হয়নি। এমনি এমনি বড় হয়েই কি তিনি পরাশরের পিতৃপুরুষের

তর্পনে লাগবেন ? যদি তার মায়ের ভবিতব্য ছিল রাজবংশের রানি হওয়া। তাহলে তার ভবিষ্যৎ কী হবে ? পিতা যখন বলেন তিনি পৃথিবী বিখ্যাত হবেন আশা করা যায়। কৃষ্ণ তখন বলেন –

> " পিতা পিতা আপনার কুৎসিত, ঘৃণিত, অবৈধ্য পুত্রকে আপনি বৃথা এসব অমৃতবাণী বোলে স্তোক দেবেন না। সে জানে সে কী ? কে ? এক চরিত্রহীন জেলেনি আর এক চরিত্রহীন মুনির ক্ষণকামের সন্তান। তার চেহারায় মুখচ্ছবিতে সেই অসংযমের কুশ্রীতা লেখা আছে।"[৪]

এতটা স্পষ্ট করে নিজের জন্মরহস্যের গভীর গোলকধাঁধায় আলোক ফেলা, সত্যিই কোনো সাধারণ চরিত্রের পক্ষে সম্ভব নয়।ঔপন্যাসিক বাণী বসু সৃষ্ট কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণের চরিত্র এক অন্য মাত্রা লাভ করেছে উপন্যাসটিতে।
রোলা বার্তের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়-

> " Myth can reach everything , corrupt everything , and even the very act of refusing oneself to it. So that the more the language – object resists at first , the greater its final prostitution ; whoever here resists completely yields completely . " [৫]

পিতা পরাশর, জানতেন পুত্র বিশেষ কাজের জন্য জন্মেছেন। নিজের অজান্তেই কৃষ্ণকে তিনি 'দ্বাপরাবতার' মনে করেছেন।কৃষ্ণ অর্থাৎ মহামুনি বেদব্যাসের নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল। পিতা পরাশর ছেলেকে বিবাহ করার কথা বলেন, সেখানেও কৃষ্ণ অকপটে জানিয়ে দেন, যদি কোনো কন্যা তাকে নিজের ইচ্ছায় বিবাহ করার করে ক্ষেত্রে মত প্রকাশ করে তবেই সে বিবাহ করবে। মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠুক সেটা চাননি কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে তার মাতা ডেকে পাঠালেন হস্তিনাপুরে।পঁচিশ বছরের ও বেশি সময় অতিক্রান্ত হবার পর। মাতৃহীন দিনরাত্রিকে সে অনায়াসে মেনে নিয়ে চলতে শিখে যাবার পর, এই মাতৃ আহ্বানে কৃষ্ণ বিচলিত নন।

সত্যবতী তার পুত্র প্রথমে চিত্রাঙ্গদ এবং পরে বিচিত্রবীর্য মারা যাওয়ার ফলে, হস্তিনাপুর রাজপুরী অরাজক হয়ে পড়ে। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী-দের শূন্য কোলে সন্তান আনয়নের উদ্দেশ্যেই কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে ডেকে আনেন সত্যবতী।

গভীর রাত্রে অম্বিকার সঙ্গে কুরুবংশের বংশধরকে আনার জন্য কৃষ্ণকে বাধ্য হয়েই মিলিত হতে হয়। রানি অম্বিকা তার, পূর্ণ চোখ মেলে কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পন করতে পারলেন না। রানি অম্বালিকার সঙ্গেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিলিত হতে হয় কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে। শয্যায় পাংশুবর্ণ হয়ে যান রানি।কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন চূড়ান্ত কষ্ট পেয়েছেন জীবনে, কিন্তু এই যন্ত্রণা তার পৌরুষত্বকে লাঞ্ছিত করেছে। তাই তিনি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। সত্যবতী, ছেলেকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। এক পরিশ্রমী দাসী-কৃষ্ণকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। দাসীর আহ্বানে সাড়া দেন কৃষ্ণ। দাসীর সেবায় যেন তৃপ্ত হন তিনি। ঠিক যেমন বুদ্ধদেব বসুর নাটকে 'অনাম্নী অঙ্গনা'-কে বলতে শুনেছি –

> " বিরাট-ভারি- অপরিমেয়- প্রায় অসহ্য।
> কিন্তু তবু,
> রাত্রি যখন সবচেয়ে স্তব্ধ অন্ধকার সবচেয়ে গভীর,
> হয়ে উঠলেন এমন অনির্বচনীয় কোমল, এমন অন্তহীনভাবে
> নির্ভার,
> যে রাত্রিশেষে, ঊষার পূর্বক্ষণে আমার মনে হ'লো
> শুধু তাঁর নিশ্বাসের ফুৎকারে আমি গর্ভিণী।" [৬]

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন মুগ্ধ হয়েছিলেন দাসীর যত্নে, আপ্যায়নে।পিতা পরাশরের মৃত্যুর খবর আসে। দ্বৈপায়ন, পিতৃহারা হন। কিছুদিন পরই তার জবালি মুনির কন্যা পিঙ্গলার সঙ্গে বিবাহ হয়।

রাজবাড়ি থেকে আবার ডাক আসে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে, পুত্রদের আশীর্বাদ করার জন্য। দ্বৈপায়ন আনন্দ যজ্ঞে সামিল হয়েও কিন্তু ক্ষত্রিয় কুলের অপদার্থতাকে তুলে ধরেছেন। দুটি রাজপুত্রের মধ্যে একজন জন্মান্ধ, অন্যজন পাণ্ডুর বর্ণের ও রুগ্ন। সত্যবতী দ্বৈপায়নকে, পুনরায় রানিদের সন্তানবতী করার কথা উচ্চারণ করলে কৃষ্ণ বলেন-

> " আমি এখন বিবাহিত গৃহস্থ, এসব আমি আর পারব না, মাপ করুন আমাকে ! "[৭]

মহামুনি বেদব্যাস সর্বদা উন্নতশির। বিজ্ঞ, পন্ডিত এই মানুষটি সত্যের জন্য আকুল।

> " ব্যাসের জীবন, উপলব্ধি, আন্তর- সংঘাত সবই তাঁকে ধীরে ধীরে মহৎ সৃষ্টির স্রষ্টায় পরিণত করেছিল, তাই পাঠকের পক্ষে তাঁর জীবন বা সৃষ্টি কোনওটারই প্রতি সাড়া দেওয়া সহজ হয় না- এত মহৎ, এত দুরূহ, এত ঐশ্বর্যবান মহাকাব্যে সাড়া দেওয়াও সে জন্যে বহু মর্মযন্ত্রণা, বোধ ও বোধির বহু যাতনাময় স্তর পেরিয়ে তবেই সম্ভব।"[৮]

মহাভারত স্রষ্টা বেদব্যাস অর্থাৎ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রতিবাদে, প্রতিরোধে যে জীবনযাপন করেছেন, তাই-ই তাকে আজও সক্রিয় চরিত্র রূপে অমর করে রেখেছে।

বাণী বসুর অপর এক উপন্যাস 'ক্ষত্তা' প্রকাশ লাভ করে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে। এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছিল মহাভারতের আরো এক অনন্য চরিত্র বিদুর।

রাজসম্পর্কহীন, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ও পরী দাসীর সন্তান হলেন বিদুর। ছোটবেলা থেকেই ধীর, স্থির, প্রাজ্ঞ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন বিদুর।সে ছোট্টবেলা থেকেই দুই দাদাকে আগলে রেখেছে। ধীর, স্থির, প্রাজ্ঞ বিদুরের কোনোদিনই কোনো কিছুর জন্যই অভিযোগ ছিল না।সন্তান ধারণে অক্ষম রাজা পাণ্ডু, তাকে ডেকে পাঠালে; কুন্তির সঙ্গে মিলিত হন তিনি।কিন্তু, নিজ সন্তানের জন্য পিতৃত্বের দাবি পর্যন্ত জানাননি তিনি। বিদুরকে নিয়ে পাণ্ডুর মনে সংশয় দেখা গেছে তার সন্তানকে সে ছিনিয়ে নেবে কিনা, কিন্তু বিদুর তার বন্ধুত্বের সীমা কোনোদিন লঙ্ঘন করেননি। যুধিষ্ঠিরকে গুপ্ত বিদ্যা শেখানোর সময়ও তিনি তার পুত্রকে আলাদা করে নিজের কাছে ডাকেননি। পিতৃহীন পাণ্ডবদের ছায়ার মতোই ঘিরে রাখতেন বিদুর।

পুত্রের মুখ থেকে কোনোদিন বিদুর শুনতে পাননি পিতা ডাক। 'তাত' বলে ডাকলেও তিনি আজীবন পিতার কার্য করে গেছেন।ক্ষত্তার পুত্রই শেষ পর্যন্ত সিংহাসনে আসীন হন।বিদুর রাজা নন, কিন্তু হস্তিনাপুরের রাজগৃহের সুদক্ষ পরিচালক হিসেবে তিনি আজও স্মরণীয়।

বাণী বসুর লেখা 'ক্ষত্রবধূ' উপন্যাসটি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ক্ষত্রিয় কূলের তিন বধূকে নিয়েই এই উপন্যাসের কাহিনিবৃত্ত রচিত হয়েছে। প্রথমেই গান্ধারীর কথা উল্লেখ করেছেন ঔপন্যাসিক। এক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের উত্থাপনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। যেখানে গোটা মহাভারত পাঠ করলে একবারও কুরুকুলের জ্যেষ্ঠ বধূর নাম খুঁজে পাওয়া যায় নি।

> "পণ্যের কি সেভাবে কোনও নাম থাকে? থাকে হয়তো জাতিনাম; গান্ধারী, কুন্তি, মাদ্রী। কিন্তু তার বেশি কী এমন ব্যক্তি যে শুধু তাকেই বোঝায় এমন একটা 'নাম' তাকে দিতে হবে !সে তো ক্ষত্রবধূ, তার কি আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে? আছে আলাদা কোনও বক্তব্য ? "[৯]

ভীষ্ম, জন্মান্ধ পাত্র অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রের জন্য পাত্রী খুঁজতে গিয়েছিলেন গান্ধার রাজ্যে; যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে।গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারী, পিতার মুখে কুরুকুলের কথা শুনে বিবাহে সম্মতি জানান।

> " – ভেবেছি। আর তো কোনও উপায় নেই পিতা। ক্ষত্রিয়কন্যা তার স্বদেশকে বাঁচাতে, স্বার্থত্যাগ ও সুখত্যাগ করতে ভয় পায় না পিতা।" [১০]

রূপে, গুণে অনন্যা পাহাড়ী মেয়ে গান্ধারী। শ্বশুর গৃহে প্রবেশ করলেন তার অতুলনীয় চোখ দুটি কাপড়ে বেঁধে। পণ করেছিলেন অন্ধ স্বামীকে কোনোদিন অতিক্রম করবেন না। প্রতিজ্ঞা থেকে কোনোদিন সরে আসবেন না স্পষ্ট জানিয়ে দেন গান্ধারী।

বীরপুরুষ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে নিজেকে কিছুতেই সমর্পিত করতে পারছিলেন না গান্ধারী। ভুলতে পারছিলেন না এই সম্পর্কের মূলে রয়েছে ভয়। পরে সংযুক্ত হয় ঘৃণা।একজোড়া সুনয়ন স্বামীর জন্য উৎসর্গ করেছেন- একথা তার মনে অহমিকা সৃষ্টি করে।সকলে তাকে 'মহাসতী' সম্মানে ভূষিত করেন। 'মহাসতী' হয়ে থাকবার লোভ সংবরণ করতে পারেন নি গান্ধারী। অন্ধ বরের তুলনায় সে বেশ উচ্চ হয়তো একথা মনে বাসা গেঁড়ে বসেছিল তার। তবে ধীরে ধীরে গান্ধারী বুঝতে পারেন ধৃতরাষ্ট্র একজন ভীত, লোভী, অসহায় মানুষ।ধৃতরাষ্ট্রকে, গান্ধারী স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ-ই করতে পারলেন না।

রাজার একমাত্র কন্যা গান্ধারী আদরে মানুষ হয়েছেন। ছোট থেকেই তিনি ভেবেছেন, তার স্বপ্নের পুরুষ বিশাল , মহানুভব, বিরাট হৃদয়ের অধিকারী হবেন।কিন্তু, যাকে স্বামী হিসেবে পেলেন তিনি ছিলেন বাইরে এবং ভিতরে সম্পূর্ণ অন্ধ।গান্ধারী, এক স্বেচ্ছা আরোপিত ছদ্ম জীবন যাপন করেছেন। নিজের সন্তান হিসেবে যাদের গ্রহণ করেছেন, তাদের জীবনে তার

কোনো প্রভাব-ই নেই। স্বামীর সঙ্গে বিবাহের প্রথম দিন থেকেই ছিল পাহাড় প্রমাণ দুরত্ব। সংসারের দিকে কোনোদিন তাকিয়ে দেখেননি তিনি।

বাণী বসু মহাভারতের গান্ধারী চরিত্রটিকে বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁকে মহানুভব করে গড়ে তোলার কোনো বাসনা-ই ঔপন্যাসিকের ছিল না।সুনয়নী, পরমাসুন্দরী গান্ধারী অল্প বয়সে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে চূড়ান্ত খেদ থেকেই প্রতিবাদী হয়েছিলেন। নিজের দৃশ্য জগতের মধ্যেই তিনি এক শক্ত প্রাচীর তুলে দিয়েছিলেন।সেই জেদের বশে সৃষ্ট আড়াল তার জীবনটাকে নিষ্প্রাণ করে দিয়েছিল।

ভোজরাজার কন্যা কুন্তী। বাল্যকাল থেকে পৃথার উপর অন্দর পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়েছিল।তাই বয়সের তুলনায় তিনি খুব বেশি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন।পৃথার স্বয়ংবর সভায় বিধি অনুযায়ী নিমন্ত্রিত হন রাজা পাণ্ডু। কন্যা স্বেচ্ছায় মালা পরিয়ে দেন রাজাকে। ধুমধাম করে বিবাহ সভা অনুষ্ঠিত হয়।রাজা পাণ্ডুকে কুন্তি ভালোবেসে ফেলেন। রাজার পাণ্ডুরতাকে জন্মগত ত্রুটি ভেবে নিজেকে প্রাণপণে বুঝিয়েছিলেন পৃথা।একদিন হঠাৎ কুন্তী জানতে পারলেন ভীষ্ম, পাণ্ডুর আরেকটি বিবাহ দেবেন। তিনি মর্মাহত হন। কেন তার কিছুদিন মাত্র বিবাহের পরই সপত্নী আনা হচ্ছে –এই প্রশ্ন তিনি সত্যবতীর উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেন। হয়ত এখানেই ক্ষত্রবধূদের অসহায়ত্ব গুলি খুব বেশি চোখে পড়ে। কখনো তাদের স্বামীদের অর্থাৎ রাজাদের রাজনৈতিক বন্ধুত্ব বাড়াতে বিবাহ করতেই হয়, এই যুক্তি শুনিয়েই শান্ত রাখা হয়।

> " এখানে খালি বীরত্ব, প্রতিজ্ঞা, সতীত্ব, উর্বরতা-এই সব গুণের দাম। মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি, কাণ্ডজ্ঞান, হৃদয়বৃত্তি ও আবেগের কোনও দাম নেই।" [১১]

রাজা পাণ্ডুকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে কুন্তী বলেছেন তিনি তাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করেননি। এই কথা কোনও ভদ্ররমণী নিজের মুখে বলতে পারেন? কেন তাঁর দ্বিতীয় বিবাহের প্রয়োজন পড়ছে? এই সমস্ত প্রশ্নবাণের সামনে যেন বোবা হয়ে যান পাণ্ডুরাজ।

কুন্তীর জীবন, সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ধাবমান। দূর্বাসা ঋষিকে সম্পূর্ণ সেবা প্রদান করতে গিয়ে কর্ণকে গর্ভে ধারণ করা, তাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে ভাসিয়ে দেওয়া। বিবাহের পরই জানতে পারলেন স্বামী পৌরুষহীন। মাদ্রীর সঙ্গে স্বামীকে ভাগ করে নেওয়া। স্বামী পাণ্ডু ও মাদ্রীর দেহাবশেষ ও পুত্রদের নিয়ে হস্তিনাপুরে, বনবাস কাটিয়ে ফিরে এসে অনিশ্চয়তার দিকে পা বাড়ানোর সাহস দেখিয়েছেন কুন্তী। জীবনের কোনো অবস্থাতেই হার মেনে পিছ-পা হননি তিনি। গান্ধারী, কুন্তী, মাদ্রী-এই তিন ক্ষত্রবধূ-ই নিজেদের অবস্থানে অবিচল থেকে যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে-ই মোকাবিলা করেছেন।

বাণী বসুর লেখা 'পাঞ্চালকন্যা কৃষ্ণা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে।এই উপন্যাসে পাঞ্চালি, দ্রৌপদী, কৃষ্ণা নামে মহাভারতের অতি পরিচিত এক নারীর জীবনের কাহিনি বিধৃত হয়েছে। মহাভারতকার খুব কম নারী চরিত্রের ব্যক্তি পরিচিতিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন; 'কৃষ্ণা' এই নামটি চরিত্রটির ব্যক্তি পরিচিতির বাহক হয়ে উঠেছিল।

কৃষ্ণার বিবাহের জন্য আয়োজিত স্বয়ংবর সভায় সর্বশ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন আসেন। তিনি থালার জলে প্রতিবিম্ব দেখে, মাছের চোখ লক্ষ করে শরসন্ধান করে লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম হলেন। কৃষ্ণা স্বামীরূপে বরণ করে নিলেন অর্জুনকে। অর্জুনের সঙ্গে তার গৃহে যাত্রা করলেন কৃষ্ণা।একটি কুটিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন তারা। অর্জুন তার মাকে জানালেন, তিনি 'ভিক্ষা' এনেছেন। ভিক্ষা? এই শব্দবন্ধ শুনেই কৃষ্ণা চমকে যান।'সে কি ভিক্ষালব্ধ ?' এই প্রশ্ন তার মনে দানা বাঁধে। সে তো বীর্যলব্ধ বলেই নিজেকে জানত। কুটিরের ভেতর থেকে মাতা কুন্তী বললেন, 'ভাগ করে নাও'- ঠিক তারপরেই মাতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য মেনে কৃষ্ণাকে পঞ্চপাণ্ডব স্ত্রী হিসেবে লাভ করলেন। মাতা কুন্তী বললেন, যা এনেছ সবাই মিলে ভোগ করো। তাহলে এখন আবার ভিক্ষাটা কিসের? তবে কি পাঞ্চালী ভিক্ষালব্ধ? নিজেকে সে বীর্যলব্ধ বলেই জানত। তাহলে এদের এতো রহস্য কিসের? এই প্রশ্নগুলি দ্রৌপদীর নিজস্ব অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পঞ্চপান্ডবের পত্নী পরিচয়েই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল কৃষ্ণার জীবন। পাঞ্চালী স্পষ্ট ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করেছেন-

> " জানি, লোকে বলবে পাঞ্চালীও তো পাঁচ পাঁচটি পতি পেয়েছে। সে তো স্বাধীনই, তাদের বলে দিও, এটা তার ইচ্ছেয় হয়নি, এটা তার স্বাধীনতার চিহ্ন নয়, বরং উপায়হীন পরাধীনতার কলঙ্কচিহ্ন।" [১২]

পাণ্ডবদের দায়িত্ববান জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠির, দ্যূতক্রীড়ায় সর্বস্ব বাজি রাখলেন। সেখানে স্ত্রী দ্রৌপদীও বাদ গেলেন না।এক অপরূপা, পরমাসুন্দরী রাজকুমারী অর্জুনকে বিবাহ করেও বাকি ভাইদেরকেও মেনে নিলেন। জীবনের সমস্ত কঠিন সংগ্রামে একা হেঁটে গেছেন।তিনি প্রকৃত বীরাঙ্গনা। তাঁর নিজস্ব মতামত তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় যুধিষ্ঠির, অর্জুন সকলকেই জানিয়েছেন।

তাঁর চরমতম ক্লীব স্বামীদের সমস্ত মহাভারত পাঠক ভৎর্সনা করেছেন। কৃষ্ণা, তাঁর উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব নিয়ে সদা ভাস্বর হয়ে রয়ে গেছেন।

পুরাণের এহেন নবনির্মাণ আমাদের চমৎকৃত করে।ঔপন্যাসিক বাণী বসু রাজা, রাজত্ব, যুদ্ধ এইসব চড়া রঙের আড়ালে লুকিয়ে থাকা খানিকটা অবহেলিত বা স্বল্প আলোচিত- চরিত্র, ঘটনা, মানবিক আদর্শ ও তাদের প্রতিবাদী কার্যকলাপের যে অনুপুঙ্খ সন্ধান দিয়েছেন তা আমাদের সত্যিই বিস্মিত করে।

তথ্যসূত্র :

১। বুদ্ধদেব বসু, মহাভারতের কথা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, মার্চ ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ২৮।
২। বাণী বসু, কালিন্দী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৬, দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন ২০১৯, পৃষ্ঠা ৪৩।
৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭০।
৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬।
৫। Roland Barthes, Mythologies, Translated by Annette Lavers, The Noonday press, new York, Twenty-Fifth Printing : 1991, page-132.
৬। বুদ্ধদেব বসু, অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৬১।
৭। বাণী বসু, কৃষ্ণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা ১১৯।
৮। সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রবন্ধ সংগ্রহ ২, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০২, পৃষ্ঠা ৩১৮।
৯। বাণী বসু, ক্ষত্রবধূ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা ১০।
১০। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১।
১১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৪।
১২। বাণী বসু, পাঞ্চালকন্যা কৃষ্ণা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা ১০৬।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ :

১। আজাদ হুমায়ুন, দ্বিতীয় লিঙ্গ (সিমোন দ্য বোভেয়ার), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১২।
২। ভট্টাচার্য তপোধীর, রোলাঁ বার্ত তাঁর পাঠকৃতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৩। সেনগুপ্ত চন্দ্রমল্লী, মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ : ২০১৫।